দৈনিক
ইনকিলাব

ইবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং সরকারী সিদ্ধান্ত

মুহাম্মদ আরিফুর রহমান

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দেশে বেশ কিছু বেসরকারী স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রচলিত রয়েছে। বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত এ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তৃণমূল পর্যায়ে নির্দিষ্ট সরকারী নিয়ম-নীতি মেনে চলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে মাদ্রাসা শিক্ষার যে ক্রমবিকাশ ও উন্নতি সাধিত হয় সে সময়ে মূলত এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর গোড়া পত্তন হয়। সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কার্যক্রম চালালেও তারা দীর্ঘ দিন যাবত সরকারী কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা পায়নি। অতঃপর ১৯৯১ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করলে তারা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেন। বিশেষ করে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কর্মসূচীকে তারা বেশ গুরুত্ব দেয়। এ কর্মসূচীর আওতায় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে আর্থিক সহায়তা দানের সিদ্ধান্ত নেয়। এরই আলোকে সরকার নিয়োগপ্রাপ্ত কয়েকজন শিক্ষককে মাসিক পাঁচশত টাকা অনুদান দেওয়া শুরু করে। সরকারের এ সিদ্ধান্ত জনমনে ব্যাপক প্রশংসিত হয় এবং শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে, শিক্ষকগণ উৎসাহিত হয়ে শিক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। মৃতপ্রায় এ ব্যবস্থাটিতে আবার প্রাণসঞ্চার হয়, দলে দলে ছাত্ররা মাদ্রাসায় আসতে থাকে। তারা দীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, অংক, ইংরেজীসহ বহুমুখী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে। ফলে সমাজের সর্বস্তর থেকে অজ্ঞতার অভিশাপ দূরীভূত হয়ে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে আরো ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়ে অগ্রসর হয়। এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোর উপরও অনেক দায়দায়িত্ব অর্পিত হয়।

অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করে। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও পরিবর্তনের ফলে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে আয়-ব্যয়ের বিরাট তারতম্য ঘটে। ফলে স্বাভাবিক কারণে এসব ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় চাকুরীরত শিক্ষকদের চাহিদাও বেড়ে যায়। তারা তাদের এ চাহিদার ন্যূনতম অংশটুকু পূরণের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মুদাররেছীনের মাধ্যমে সরকারের নিকট তাদের অনুদানটা বৃদ্ধির জন্য আহ্বান জানায়। তারা তাদের চাহিদার ব্যাপকতা না ঘটিয়ে শুধু এটুকু দাবী করেন যে, বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মত তাদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হোক। দীর্ঘদিন ধরে তারা তাদের এ বক্তব্যটুকু সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের কর্ণকুহরে পৌছানোর চেষ্টা করে। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস কোন অদৃশ্য আড়ালের কারণে সে দাবী যেন যথাস্থানে পৌছে না। এটা সবার কাছে পরিষ্কার যে,'পাঁচশ' টাকা দিয়ে বর্তমান একটি নিম্ন বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক সপ্তাহের ব্যয় খরচ হয় না। তাছাড়াও একজন শিক্ষকের সামাজিক পরিচিতি আছে, সামাজিক মর্যাদা আছে এবং অনেক দায়-দায়িত্ব। এ স্তরের একটি ব্যক্তির 'পাঁচশ' টাকা পকেট খরচ হওয়ারও কথা নয়, এখন প্রাথমিক পর্যায়ের একটি টিউশন মাষ্টারকে যেখানে এক হাজার টাকার উপরে সম্মানী দেওয়া হয় সেখানে একজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষককে 'পাঁচশ' টাকা অনুদান দেওয়া হয় এটা খুবই বিব্রতকর নয় কি? অনেকে বলে থাকেন এটা তাদের বেতন নয় বরং সম্মানী। তাই এটা যা দেয় তা নিয়ে সন্তুষ্ট থেকে তারা অন্যভাবে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পারে। এ ধরনের মানসিকতা কত যে পুরানো এবং অযৌক্তিক তা সহজেই অনুমেয়। কারণ বর্তমান সরকার এসব প্রতিষ্ঠানে এত দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে যে, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কাজের বাইরে অন্য কোন কাজ করার অবকাশ থাকে না। একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে সব দায়িত্ব এবং কার্যসূচী রয়েছে একটি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার সমান দায়িত্ব ও কার্যসূচী রয়েছে। এবং এগুলো তাদেরকে পালন করতে হয়। সরকারের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অফিসসমূহে তাদের কার্যক্রমের বিবরণ জানাতে হয় আবার একইভাবে সরকারী অফিস থেকে এসব প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শনে যাওয়া হয়। সরকার বর্তমান-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি চালু করেছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী/টাকা প্রদান কর্মসূচী চালু রয়েছে। বিনামূল্যে বই প্রদান কর্মসূচী ও চালু হয়েছে। প্রাথমিক, সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষাসমূহও যথাযথ নিতে হয় তদুপরি বার্ষিক প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হয় এসব বিষয়ের রিপোর্ট সরকারী অফিসে জমা দিতে হয়। আবার প্রতি বছর প্রতিষ্ঠান নবায়ন (মঞ্জুরী) করতে হয়। জমিজমার হিসাবে পত্রসহ যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ব্যাপারে সরকারের নিকট রিপোর্ট দিতে হয়, সরকারী তালিকা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান খোলা রাখতে হয় এবং বন্ধ দিতে হয়। যথাসময়ে ক্লাস নিতে হয় এবং যথাসময়ে ছুটি দিতে হয়। এতসব কর্মসূচী পালন করতে গেলে তাদের অন্য কোন পেশায় জড়িত হওয়ার সময় থাকে না। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় সরকার তাদের উন্নয়ন বা পুনর্বাসন কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করায়। সরকার প্রদত্ত সব দায়িত্ব পালন করে একজন শিক্ষক অন্য কাজ করার কোন সুযোগ থাকে না। প্রাথমিক বিদ্যালয় বা এ সংক্রান্ত বিষয়াদীতে যারা সম্যক অবগত আছেন তারা জানেন যে, বর্তমানে একজন প্রাইমারী শিক্ষকের এত দায়-দায়িত্ব যে, অনেক সময় অফিসের পরে বাড়ীতে গিয়ে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত কাজ করেও শেষ করা মুশকিল। তবে তাদের ব্যাপারে আশার কথা হচ্ছে সরকার তাদেরকে মোটামুটিভাবে একটি সন্তোষজনক বেতন ভাতা দিচ্ছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে একই সমান দায়-দায়িত্ব পালন করে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকরা তার কিয়দংশও পাচ্ছেন না। আরো দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকরা যা পাচ্ছেন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী শিক্ষকরা তার এক তৃতীয়াংশও পাচ্ছেন না। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য এবং দুঃখবোধের বিষয় কি হতে পারে? এর চেয়ে বড় বিমাতাসুলভ আচরণ কি হতে পারে? বিগত বিএনপি সরকার যা চালু করে ছিল আওয়ামী লীগ এসে তার অনেক কিছুই পরিবর্তন করেছে এবং মঞ্জুরি বাতিল করেছে। সে সময়ে এসব মাদ্রাসা সরকারের পক্ষ হতে একটি পয়সাও কোন উন্নয়ন কাজের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা পায়নি। সে সময় এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা আন্দোলন করেছিলেন তাদের সামান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু সরকার জুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের আন্দোলন থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সেসময় এসব মজলুম শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি যদি ক্ষমতায় ফিরে আসেন তাহলে তাদের ন্যায্য দাবি যথাযথভাবে পূরণ করবেন। ২০০১ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে বিপুল ভোটে বেগম জিয়ার জোট বিজয়ী হলে শিক্ষকরা স্বস্তিবোধ করেছিলেন এই ভেবে যে, জনগণের নেতা হিসেবে বেগম জিয়া এবং তার সরকার এসব হতভাগা শিক্ষকদের ন্যায্য দাবিসমূহ পূরণের লক্ষ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে এবং শিক্ষার ব্যাপক প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সময় এগিয়ে চলছে আর শিক্ষকরা প্রতীক্ষার প্রহর গুণছেন কিন্তু কোথাও যেন তারা আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না। ইতিমধ্যে সরকার তার পাঁচ বছর মেয়াদের তিন বছর পূর্ণ করে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করেছে কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। ফলে তাদের প্রতীক্ষার যন্ত্রণা আরো দীর্ঘায়িত হচ্ছে এবং চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছে। তাদের মাথায় যেন চাঁদ ভেঙ্গে পড়ছে এবং অমাবস্যা তাদের যেন বেষ্টন করে আছে। এতদিন তারা তাদের পরিবার-পরিজনকে চাহিদা পূরণের প্রশ্নে ভবিষ্যতের আশায় ভুলিয়ে রাখছিলেন কিন্তু এখন কি জবাব দেবেন তাদের চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারে তা এখন নির্ধারণ করতে পারছেন না। এসব ভেবে তারা এখন বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ছেন এবং হতাশা ও মানসিক যন্ত্রণা তাদের জীবনী শক্তিকে ক্রমে ক্রমে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলছে।

ইতিমধ্যে সরকার শিক্ষার উন্নয়নে অনেক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে এবং অনেক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে যা সত্যেই প্রশংসনীয়। সরকারের এ উদ্যোগের ফলে বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক গুণগতমান পরিবর্তন হয়েছে। জাতি হিসেবে আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম হচ্ছে কিন্তু একটি শ্রেণীর শিক্ষকদের এভাবে অনাদরে অবহেলায় রেখে আমরা কতটুকু এগিয়ে যেতে পারব সেটা এখন বড় প্রশ্ন। এ কথা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, এসব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ কর্মসূচীকে এগিয়ে নিতে বিরাট ভূমিকা রাখছে। গ্রামের পিছিয়ে পড়া শ্রমজীবী মানুষের ছেলে সন্তানদের শিক্ষার আলো বিতরণ করে এসব প্রতিষ্ঠান দেশ ও জাতির কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারও বিষয়টি বুঝতে পেরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচীতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, ছাত্রী বৃত্তি, বিনামূল্যে বই প্রদান প্রভৃতি কর্মসূচীতে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। কিন্তু যেসব শিক্ষক এসব কর্মসূচী এগিয়ে নেবেন, যারা শিশুদের অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দেবেন, যারা তৃণমূল পর্যায়ে জ্ঞানের আলো বিতরণ করবেন তাদের পেটে যদি ভাত না থাকে, তাদের পরিবার-পরিজন যদি না খেয়ে অভুক্ত থাকে, তাদের ছেলে সন্তানরা যদি সুচিকিৎসার অভাবে অকালে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তাদের পক্ষে কি এ বিরাট দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব? বাস্তব সত্য হচ্ছে, কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার 'চিঠিপত্র' কলামের একটি চিঠির কথা আমার মনে পড়ে গেল, যে চিঠিটা লিখেছিলেন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার একজন শিক্ষক। চিঠিটা ছাপা হয়েছিল গত কোরবানী ঈদের কিছুদিন পর। তারিখটি এখন স্মরণ নেই। যেটুকু মনে পড়ে চিঠির শিরোনাম ছিল সম্ভবত 'এক টুকরো মাংস এবং একজন শিক্ষক'। এ চিঠিটি যারা পড়েছেন বা যাদের মনে আছে তারা অনুধাবন করেছেন যে, একজন শিক্ষক সামাজিকভাবে কত অযত্ন, অবহেলার শিকার এবং মানসিকভাবে কত যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছেন। এ চিঠি পড়ে নিশ্চয় যে কোন হৃদয়বান ব্যক্তির অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব হয়েছিল। সে চিঠিতে ঐ শিক্ষক করুণভাবে অংকিত করছিলেন তার ছেলের কোরবানীর মাংস খাওয়ার ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে তাকে যে তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তার বেদনাবিধুর চিত্র। এ চিঠির কথা মনে পড়লে আমার হৃদয় এখনও ব্যথায় ভরে ওঠে, মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এসব শিক্ষকদের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে শরীর অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোথায় পড়ে আছি আমরা, কোথায় আমাদের উন্নতি, কোথায় আমাদের অগ্রগতি? কোথায় আমাদের দেশপ্রেম, কোথায় আমাদের মানবতা?

দেশের উন্নতি এবং অগ্রগতির সাথে শিক্ষার উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, আর শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া বর্তমান বিশ্ব ব্যবহার উপযোগী দেশ গড়া কখনো সম্ভব নয়। আর শিক্ষার উন্নয়ন চাইলে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত এ বিশেষ শ্রেণীকে বাদ দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। কারণ, তাদের সাথে জড়িত আছে দেশের জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ। তাই আমরা সরকারের নিকট বিশেষভাবে দাবি জানাই, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো এবং এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক বাস্তবমুখী এবং ইনসাফপূর্ণ (সমমর্যাদার ভিত্তিতে) কর্মসূচী গ্রহণ করা হোক। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি আমরা বর্তমান সরকারের বাকি দুই বছরের মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও সমাজকর্মী